উত্তরসূরি

মাসিক বৈঠকী মুখপত্র।। দুই ।। ৩০ আগস্ট ২০২৫

কবি জীবনানন্দ দাশ আলোচনা সংখ্যা

বহমান সময়ের জাগ্রত প্রতিনিধি জীবনানন্দ

ড. নির্মল কুমার সরকার

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) বিংশ শতাব্দীর একজন অন্যতম আধুনিক বাঙালি কবি। বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃত হিসেবে যে কয়েকজনের নাম উচ্চারিত হয়, জীবনানন্দ দাশ নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন। কালের বিচারে এ কথা আজ নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'র মধ্যে জীবনানন্দ প্রকৃত অর্থেই একজন কবি। কবিতার পাশাপাশি গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে রেখে যাওয়া জীবনানন্দের অনন্য স্বাক্ষর সমূহও আজ সর্বজন স্বীকৃত। দেশের, বিশেষ করে দেশের বাঙালি নাগরিকদের বর্তমান দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা প্রেমিক জীবনানন্দ নিঃসন্দেহে আজ ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী জীবনানন্দের জীবন, সুবিশাল ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য প্রতিভার আলোচনা সীমিত পরিসরের নির্ধারিত কিছু শব্দবন্ধে আবদ্ধ করা অসম্ভব। এ কথা মাথায় রেখে, বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে আমরা এই বিশাল ব্যক্তিত্বের সুবিশাল কাব্যসম্ভারের শুধুমাত্র গোটা কয়েক সৃষ্টিতে প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গিতেই আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখব।

"যদি আমরা ধরে নিই যে, কবিতা হলো বাস্তবতা ও ভাষা এই দুইয়ের সংঘর্ষে ও মিথস্ক্রিয়ায় উৎপন্ন তৃতীয় কিছু, যার নান্দনিক মাত্রা আছে, তা হলে এটা মেনে নিতে হবে যে, বিশ্ববীক্ষা ছাড়া বাস্তবতাকে সম্যক আত্মস্থ করার সম্ভাবনা কম।"

(নতুন বীক্ষা নতুন সংজ্ঞা: নতুন কবিতার সন্ধান, চিরঞ্জীব শূর, কালি ও কলম, ৩১ জুলাই ২০২১)।

জীবনানন্দের কবিতা যে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিশ্ববীক্ষার মাধ্যমে বাস্তবতাকে সম্যক আত্মস্থ করার পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ, সে ব্যাপারে আজ আর কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়। বিশ্বচেতনার সঙ্গে নিজের চেতনাকে যুক্ত করে, তার রস আস্বাদন করে সেইটুকু প্রকাশ করার মধ্যেই একজন প্রকৃত কবির সার্থকতা নিহিত। জীবনানন্দের ভাষায় *"গত তিন-চার হাজার বছর মানুষের সভ্যতায় দর্শন কাজ করে গেছে, এইবারে বিজ্ঞান কাজ করবে বলে মনে হয়। তবে দর্শনের চেয়ে গণস্পষ্ট পৃথিবীর দরবারে শুভ সত্যকে বিজ্ঞান বেশি আয়ত্ত করতে পারবে বলে মনে হয়। কাব্য সৃষ্টির সময় বিজ্ঞান ও দর্শন নিজেদের মোটামুটি সত্যে আছে কবির হৃদয়ে, সেখান থেকে কাব্যের সত্যে একটা তারণ স্পর্শের ফলে ক্রমেই উত্তীর্ণ হচ্ছে।" (সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা)।*

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আধুনিক কবিতার নাড়িনক্ষত্র ও দর্শন জীবনানন্দ জানতেন, বুঝতেন কবিতার গতি-প্রকৃতি। যে কারণে কবিতায় পরিবর্তনের ইতিবাচক রূপান্তর তিনি ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দের ভাষ্য–

"হতে পারে কবিতা জীবনের নানারকম সমস্যার উদ্ঘাটন, উদ্ঘাটন দার্শনিকের মতো নয়; যা উদ্ঘাটিত হলো তা যে কোনো জঠরের থেকে হোক আসবে সৌন্দর্যের রূপে, আমার কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে; যদি তা না দেয় তা হলে উদ্ঘাটিত সিদ্ধান্ত হয়তো পুরনো চিন্তার নতুন আবৃত্তি, কিন্তু তবু তা কবিতা হলো না, হলো কেবল মনোবীজরাশি। কিন্তু সেই উদ্ঘাটন-পুরনোর ভেতরে সেই নতুন কিংবা সেই সজীব নতুন যদি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করতে পারে, আমার সৌন্দর্যবোধকে আনন্দ দিতে পারে, তা হলে তার কবিতাগত মূল্য পাওয়া গেল।" (কবিতার কথা)।

জীবনানন্দ ছিলেন বহমান সময়ের একজন জাগ্রত প্রতিনিধি। বিশ্ব, দেশ-কাল বা সমাজ সচেতন কবি হিসাবে জীবনানন্দের অজস্র কীর্তি সময়ের স্রোতে চির অমলিন। দুটো বিশ্বযুদ্ধ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন; প্রত্যক্ষ করেছেন বড়-ছোট বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বিষময় সাম্প্রদায়িক সংঘাত এবং দেশভাগের চরম যন্ত্রণা জীবনানন্দ বয়ে নিয়ে বেরিয়েছেন নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়। অন্ধ পথ প্রদর্শক, ধর্মান্ধ মৌলবাদী এবং তাদের অন্ধ অনুসরণকারিদের দেখেছেন তিনি সজাগ দৃষ্টি নিয়ে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে তিনি এক মানবতাবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন–

"মহামৈত্রীর বরদ-তীর্থে-পুণ্য ভারতপুরে/পূজার ঘন্টা মিশিছে হরষে নমাজের সুরে সুরে!/আহ্নিক হেথা শুরু হয়ে যায় আজান বেলার মাঝে,/মুয়াজ্জেনের উদাস ধ্বনিটি গগনে গগনে বাজে,/জপে ঈদগাতে তসবি ফকির, পূজারী মন্ত্র পড়ে,/সন্ধ্যা-উষার বেদবাণী যায় মিশে কোরানের স্বরে;/ সন্ন্যাসী আর পীর/মিলে গেছে হেথা,-মিশে গেছে হেথা মসজিদ, মন্দির!"(হিন্দু-মুসলমান)।

মানবতাবাদের বিপরীত মেরুতে অবস্থানরত ধর্মান্ধ মৌলবাদ এবং ক্ষমতা-মোহে অন্ধ রাজনীতির যুগলবন্দীর দাপট এবং বীভৎস পদ সঞ্চালনে মানবতাবাদী জীবনানন্দের মানবতাবাদের স্বপ্ন বিস্তৃতভাবে ব্যাপক পরিসরে আজো কি কোথাও বাস্তবের মাটিতে পা রাখতে সক্ষম হয়েছে? 'Devide and rule' নীতির শিকার ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা বিশ্বের সর্বত্র মানব সমাজের সকল সদস্য কি আজো বোঝে– ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

সম্পর্কে একটি ধর্মান্ধ মৌলবাদ বিপরীতধর্মী আর একটি ধর্মান্ধ মৌলবাদের সম পরিমাণ প্রতিক্রিয়ার উত্থান ঘটায় মাত্র; একটি ধর্মান্ধ মৌলবাদ দিয়ে আর একটি ধর্মান্ধ মৌলবাদকে চিরস্থায়ীভাবে কখনো দমন করা যায় না!

সমসাময়িক মানব সভ্যতার কলঙ্কজনক অধ্যায়সমূহের চালচিত্র নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে জীবনানন্দের বেশ কিছু কবিতায়। প্রেমহীনতার সঙ্গে রক্তাক্ত সহিংসতার বাস্তবরূপও ঠাঁই পেয়েছে সেখানে। সমাজের যন্ত্রণাকাতর সময়ে জীবনের বীভৎস এবং হতশ্রী ছবি ধরা পড়েছে জীবনানন্দের কবিতার ক্যামেরায়। অর্থনৈতিক শোষণের দুঃসহ অবস্থা, নগরজীবনের জটিলতা, বিশ্বইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, বিশ্বরাজনীতি ইত্যাদি সবকিছুই আমরা চাক্ষুষ করি সেই ছবিতে। জীবনানন্দের নিজের কথায়–

"সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কেও আমার কবিতা চেতনা হয়তো দেখিয়েছে, আরও বড় চেতনার উত্তরপ্রবেশ চেয়েছে।" (ময়ূখ পত্রিকা)।

জীবনানন্দ সময়কে চিত্রিত করেছেন হৃদয়ের গভীর স্পর্শে–

"পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু/এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান/হৃদয়কে চোখঠার দিয়ে ঘুমে রেখে/হয়তো দুর্যোগে তৃপ্তি পেতে পারে কান;/…..রাতকে উপেক্ষা ক'রে পুনরায় ভোরে/ফিরে আসে; তবুও তাদের কোনো বাসস্থান নেই,/যদিও বিশ্বাসে চোখ বুজে ঘর করেছি নির্মাণ/ঢের আগে একদিন; গ্রাসাচ্ছাদন নেই তবুও তাদের,/যদিও মাটির দিকে মুখ রেখে পৃথিবীর ধান/রুয়ে গেছি একদিন; অন্য সব জিনিস হারায়ে,/……আমরা তো বহুদিন লক্ষ্য চেয়ে নগরীর পথে/হেঁটে গেছি; কাজ ক'রে চলে গেছি অর্থভোগ ক'রে;/ভোট দিয়ে মিশে গেছি জনমতামতে।/গ্রন্থকে বিশ্বাস ক'রে প'ড়ে গেছি;/সহধর্মীদের সাথে জীবনের আখড়াই, স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা/…..তবুও কোথাও কোনো প্রীতি নেই এতদিন পরে।/ নগরীর রাজপথে মোড়ে-মোড়ে চিহ্ন পড়ে আছে।/ একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে/ তবুও আতঙ্কে হিম-হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।"(বিভিন্ন কোরাস)।

অন্ধ পথ প্রদর্শকদের প্রদর্শিত পথে অনুসরণকারীর সংখ্যা সমাজে যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশ্ব-দেশ বা সমাজের এই নগ্ন চেহারাটিও জীবনানন্দের কবিতায় ধরা পড়েছে সুতীব্র মানসিক যন্ত্রণায়–

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,/যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;/যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই–প্রীতি নেই–করুণার আলোড়ন নেই/পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।/যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি/এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়/মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা/শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।"

একইভাবে নিজের বিভিন্ন সৃষ্টিতে জীবনানন্দ সমকালীন নষ্ট জীবন এবং বিভিন্ন দিকে ক্ষয়ে যাওয়া সভ্যতার নগ্ন চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে তার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন করার প্রয়াসে আজীবন হেঁটেছেন যুক্তি এবং মানবতাবাদের পথে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, সমাজের নগ্ন বীভৎস রূপ ঠিকঠাক দর্শন করতে ব্যর্থ হলে তা থেকে উত্তরণ অসম্ভব। নিবন্ধের প্রথম পর্বেই বলা হয়েছে, জীবনানন্দ ছিলেন সময়, সমাজ এবং ইতিহাস সচেতন এক ব্যক্তিত্ব। সমাজ এবং দেশের বিভিন্ন বীভৎস-ঘৃণ্য চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে তিনি এ অবস্থা-ব্যবস্থার নিরসন চেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমাদের বা আমাদের দেশ বা বিশ্ব সমাজের আদৌ কোনো আকাঙ্ক্ষিত উত্তরণ ঘটেছে কি? না কি নিজের জীবনকালে জীবনানন্দ সমাজ জীবনে যে 'অদ্ভুত আঁধার' প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা আজ আরো অধিকতর গাঢ় হয়েছে এবং হচ্ছে? এ অবস্থায় আমাদের করণীয়? সুসজ্জিত প্রেক্ষাগৃহে/ড্রয়িং রুমে ততোধিক সুসজ্জিত পোশাকে আবৃত হয়ে জীবনানন্দ সম্পর্কে বাছা বাছা কিছু আলংকারিক শব্দবন্ধ উচ্চারণ/শ্রবণ করেই কি আমরা আমাদের দায়িত্ব শেষ করব? না কি কথায় এবং কাজে মিল রেখে আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবনে জীবনানন্দীয় আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন ঘটাব? এই বিষয়কে ভিত্তি করেই আজ আমাদের সকলের সামনে এক প্রকাণ্ড প্রশ্নচিহ্ন ঝুলছে? আকাঙ্ক্ষিত সমাধান কোন পথে, কিভাবে-কোথায়?

জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' এবং তাঁর প্রেম, প্রকৃতি, শিল্প চেতনা

সুব্রত চৌধুরী

সারা জীবন ধরে প্রকৃতিকে ভালোবেসে, প্রকৃতির মধ্যেই জীবনকে গ্রহণ করেছেন, কবি জীবনানন্দ দাশ। বিশ্বসাহিত্যে এমন কবির সংখ্যা খুব বেশি নয়। রবীন্দ্র পরবর্তী কালে, বাংলা সাহিত্যে, আধুনিক কবিতার রূপকার হিসেবে তাঁকে ই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দেওয়া হয়।

তাঁর কবিতায় বিচিত্র প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ মাধুরী যেমন রয়েছে, রয়েছে রোমান্টিক প্রেমের আশ্চর্য কথকতা। যিনি সাধারণকেও করেছেন অসাধারণ।

বিশ্বসাহিত্যের বরণ্য কবি জন কীটস্, উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, পিবি শেলী, প্রমুখদের যেমন, প্রকৃতির কবি বা রোমান্টিক কবি বলা হয়ে থাকে, বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ও আমরা প্রকৃতি ও প্রেমের এক অসাধারণ রোমান্টিক রসায়ন লক্ষ্য করি।

বলা হয়ে থাকে, কবির 'বনলতা সেন' কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতাই 'বনলতা সেন'। বহুল পঠিত ও আলোচিত এই কবিতার ভাব, কবি 'এডগার অ্যালান পো'এর কবিতা 'হেলেন'থেকে অনুপ্রাণিত। তবে, কবি নিজেই যেমন তাঁর কাব্য গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন,

"কবিতা আসলে রসের ব্যাপার, এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের, বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস।"

কেউ কেউ আবার 'বনলতা সেন' কাব্যের কবিকে 'নির্জনতার কবি, বিষণ্ণতার কবি রূপে আখ্যায়িত করেছেন। তো কেউ বলছেন- প্রকৃতি ও প্রেমের কবি। আবার কেউ, ইতিহাস ও সমাজ চেতনার এবং অবচেতনার ও কবি বলছেন তাঁকে। আসলে কবি বোধ হয় 'সুর রিয়ালিস্টিক'!

বনলতা সেন কবিতার সূত্র ধরে আমরা জীবনানন্দকে 'প্রেম ও প্রকৃতির' কবি রূপেই দেখার চেষ্টা করি। জীবনানন্দ আসলেই প্রেমের কবি। এই প্রেম কখনো প্রেয়সী রূপে 'নাটোরের বনলতা সেন', কখনো প্রকৃতির কাছে নতজানু তো কখনো 'মানবিক'রূপে মাটির কাছাকাছি। আবার এই কবি কখনো নিরাশার, বিষণ্ণতার, মৃত্যু চেতনায় 'ক্লান্ত'।

'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন' এই অসাধারণ পংক্তিটি আমাদের কখনো 'কীটস্'এর সেই বিখ্যাত লাইনটি মনে করিয়ে দেয়- 'এ্য থীং ওব বিউটি ইজ এ্য জয় ফর এভার'। যেনো শুধু 'নীড়' নয়, একটা আস্থা, একটা শান্তি, মুগ্ধতার গভীর আশ্রয়। 'বনলতা সেন'- এক অবিস্মরণীয় অমূর্ত নায়িকা যার 'পাখির নীড়ের মত চোখ' 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' খচিত মুখমন্ডল, 'বিদিশার নিশা'র মতো অন্ধকার রং চুল, নিয়ে যেনো বসে আছে কবির প্রতীক্ষায়। কী অসাধারণ বাক-প্রতিমা।

'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'- বনলতা সেন কবিতার এই বিখ্যাত লাইনটি আমাদের চিনিয়ে দেয় 'সুর রিয়ালিস্ট ও মিস্টিক'এই রহস্যময় কবিকে। যে কবিতার দ্বিরালাপে আসে বিস্ময়কর কিছু চিত্রকল্প, যা একই সাথে, প্রেম ও প্রকৃতি ইতিহাস ও ভুগোলের রূপকে বিস্ময় জাগায়। কবিতায় যেমন আছে আশ্রয়, আছে ক্লান্তি আছে মৃত্যু চেতনাও। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' এ কী কেবলই একটি পংক্তি মাত্র! প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক সংকট, উপনিবেশবাদ, মানবিক অবক্ষয়, সমকালীন সমাজের বন্ধ্যাত্ব আর অন্তঃসারশূন্যতা জীবনানন্দের কবি মনেও গভীর রেখাপাত করেছিলো। অস্তিত্ববাদী চেতনার সংবেদনশীলতা, কবিকেও কশাঘাত করছিলো মানবিক অস্তিত্বের এই দেউলিয়া পনা। এক ভয়াবহ শূন্যতার বিপন্নতায় ভোগছিলেন যেনো 'বিদিশার নিশা' যাপনে। তবুও অন্তত 'দু, দন্ড শান্তির' খোঁজে কবি 'বনলতা সেন' এ খুঁজে নেন আশ্রয়।

তার কবিতায় শব্দ বুনন, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, এবং নান্দনিকতা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। চিত্রকল্প নির্মাণে যেমন জীবনানন্দের অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কবিতার ছন্দ মাধুর্যেও এই কবিতা অতুলনীয়। অসামান্য কবিতাটিকে তাই বলা যায়, এক অতীন্দ্রিয় প্রেমের কবিতা, যার সারা শরীরে লেপ্টে আছে প্রকৃতি আর রোমান্টিকতা। অনন্ত সময়ের হাত ধরে- অতিন্দ্রীয় প্রেম চেতনায় তাঁর কবিতা তাই আমাদের অপার বিস্ময়!

'বনলতা সেন': নারীমূর্তি না কি বিমূর্ত আকাঙ্ক্ষা?

ড. অর্পিতা রানী দাস

বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর কাব্যিক সৃষ্টি 'বনলতা সেন', যার প্রতিটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক অনন্ত সময়চেতনা, নিঃসঙ্গতার গভীর আর্তি এবং আত্মা সন্ধানী এক কবির অন্তরীক্ষ। এই কবিতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এক নারীচরিত্র—নাটোরের বনলতা সেন, যাঁকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে চিরায়ত আকর্ষণ, সৌন্দর্য ও আত্মিক পরিতৃপ্তির এক অসীম রূপকল্প। প্রশ্ন জাগে—এই বনলতা সেন কি সত্যিই একজন বাস্তব নারীমূর্তি, নাকি তিনি কেবল একজন ক্লান্ত কবির অন্তরজগতের রূপায়িত আকাঙ্ক্ষা, এক অলীক স্নিগ্ধ মুখ, এক দৃষ্টিসুখ বা নিঃসঙ্গতার আদর্শ আশ্রয়?

'বনলতা সেন' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে, 'কবিতা' পত্রিকায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দারিদ্র্য, সমাজচ্যুতি, অস্তিত্বের প্রশ্ন—এই সমস্ত কিছুর মধ্যে জীবনানন্দ খুঁজছেন এক মানসিক আশ্রয়। 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'— এই লাইন দিয়ে যে যাত্রা শুরু, তা আসলে এক অন্তর্জগতের বিপন্ন অনুসন্ধান। পথিকের এই পথচলা কেবলমাত্র সময়ের নয়—এ এক দার্শনিক ক্লান্তি, যা কবিকে ঠেলে দেয় 'বনলতা সেন' নামক কবিতার মুখোমুখি। কবিতার পরবর্তী লাইনগুলিতে আমরা পাই এক নারীর সৌন্দর্য ও প্রশান্তির চিত্রণ—

"চুল তার কাঞ্চন দীপ্তি, মুখ তার শান্তির বাণী—
পাখির পালকের ছায়া যেন তার মুখে ছায়াপাত করে।"

এই বর্ণনাগুলো যেন এক নারীকে স্পষ্টভাবে চিত্রায়িত করে—নয়নের গভীরতা, চুলের দীপ্তি, মুখের প্রশান্তি সবকিছুতেই মূর্ত নারীত্বের স্পর্শ। এখানে নারী এক অচল আশ্রয়, এক নির্মিত শান্তি। কবির উচ্চারণ

"সেই মুখ, আমি একবার দেখিয়াছিলাম; জীবন আমার ধন্য হইয়াছে।"

প্রমাণ করে বনলতার অস্তিত্ব কেবল চিত্রকল্প নয়, অনুভবযোগ্য।' বনলতা সেন'—এই নামটি নিজেই বহন করে বহুবিধ সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক ইঙ্গিত:

'বন': প্রকৃতির প্রতীক, বিশাল ও শাশ্বত

'লতা': কোমলতা, নারীত্ব, বিনয়

'সেন': একটি মধ্যবিত্ত সাংস্কৃতিক বর্গ, যা মধ্যযুগীয় স্মৃতিকে ধারণ করে।

নারীমূর্তি হিসেবে বনলতা সেন দেহজ, সৌন্দর্যমণ্ডিত, আশ্রয়দাত্রী এক কাব্যসত্তা।

জীবনানন্দ দাশের কবিতার নারীরা সাধারণত নিঃশব্দ, আত্মগোপন, স্মৃতিচিহ্নিত, এবং পুরুষচেতনার অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষা দ্বারা নির্মিত। বনলতা সেন-ও এর ব্যতিক্রম নন—তিনি সেই নারী, যিনি হেমন্তের মতো চুল, আলোঝলসানো পাখির চোখ এবং স্নিগ্ধ মুখ নিয়ে পুরুষকবির ক্লান্ত জীবনের চূড়ান্ত অবসানের জায়গায় উপবিষ্ট। তাঁর মুখে নেই কোনো বক্তব্য, তাঁর কণ্ঠে নেই কোনো প্রতিবাদ, তিনি কেবলমাত্র বসে থাকেন—একজন নিঃশব্দ শ্রোতার মতো, যার দিকে তাকিয়ে কবি খুঁজে পান শান্তি, উত্তরাধিকার ও মুক্তি।

এই পাঠে বনলতা নারী—কিন্তু সেই নারী, যিনি পুরুষসত্তার চাহিদা পূরণের উপযোগী হয়ে উঠেছেন; তিনি আদর্শ নারী, প্রেমিকা, ঈশ্বরী অথবা মাতৃসত্তা—তাঁর উপস্থিতিই শান্তির পূর্বশর্ত। তবে এই নারীসত্তা কি বাস্তব কোনো ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত? না কি তিনি একান্তভাবে কবির কল্পনায় নির্মিত, পুরুষস্বপ্নের আদলে গড়া এক আদর্শ সাবলীল চরিত্র?

"মল্লার গৌড় হরপ্পার ক্লান্তি নিয়ে আমি এসেছি তোমার কাছে"—এই পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে বোঝা যায়, বনলতা সেন কেবল একজন নারী নন, তিনি ইতিহাসের পুঞ্জীভূত ক্লান্তির প্রতীক। এই ক্লান্তি কেবল ভ্রমণের নয়, বরং অস্তিত্বের—এটি সভ্যতার, জাতির,

ব্যক্তিমানুষের ক্লান্তি–যার অন্তিম আশ্রয় বনলতার চোখের পল্লব ছায়া।

এখানে নারী হয়ে ওঠেন ইতিহাসের বিপরীতে একধরনের নিরব অক্ষয়তা, যিনি সময়ের সীমা ছাড়িয়ে আত্মার পরিত্রাণে সমর্পিত। ফলে বনলতা হয়ত নারী, কিন্তু তিনি সেই নারী, যিনি সময়ের গহ্বরে স্থির হয়ে রয়েছেন–এক অনুপম প্রেক্ষাপট হয়ে।

যখন কবি বলেন, *"সব পাখি ঘরে আসে–সব নদী, ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন"* তখন বোঝা যায়, বনলতা সেন একধরনের ঘরে ফেরার রূপক। তিনি যেন সকল সংঘাত, প্রত্যাখ্যান, ক্ষয় ও গ্লানির শেষে সেই চুপ করে বসে থাকা নির্ভরযোগ্য সত্তা, যার পাশে বসেই মানুষ ভুলতে চায় নিজের যন্ত্রণার ইতিহাস। বনলতা এই পাঠে একজন নারী নন, বরং এক চেতনার নির্মাণ, এক আত্মিক শান্তির আদল, যিনি কবির অবচেতনের গভীরে গড়ে ওঠা এক স্বপ্নসৌধের দৃষ্টান্ত।

তিনি কোনো ব্যক্তি নন, কোনো প্রেমিকা নন, তিনি সেই স্থান বা সত্তা, যেখানে ক্লান্ত পথিক ফিরে পায় সময়ের ঊর্ধ্বতন এক প্রশ্রয়। এই ব্যাখ্যায় বনলতা হলেন এক প্রেক্ষাপট, এক মানসিক অবকাশস্থল, এক অব্যক্ত আর্তির অবলম্বন, যিনি কেবল কবির ভেতরেই বাস করেন।

নারীবাদী পাঠ অনুসারে, বনলতা সেন এমন এক নারীমূর্তি যিনি স্বয়ং কিছুই বলেন না, তিনি কেবল দেখা ও উপলব্ধির বিষয় হয়ে থাকেন। তিনি একজন পুরুষকবির দৃষ্টির অধীন নির্মিত, যিনি বসে আছেন, কিন্তু কথা বলেন না; যাঁর ভূমিকা কেবল পুরুষের ক্লান্তি লাঘব করা। এই ধরনের চরিত্রায়ন নারীর স্বরহীনতা ও পরাধীনতা নির্দেশ করে–যেখানে নারীর অভিজ্ঞতা, চাহিদা বা আত্মপরিচয় অনুপস্থিত। বনলতা এখানে একজন সাজানো, কল্পনায় গড়া রূপক, যিনি পুরুষের কামনা ও নিঃসঙ্গতার কাঠামোতে নিজেকে জুড়ে নেন। এই পাঠে বনলতা নারী না হয়ে হয়ে ওঠেন পিতৃতান্ত্রিক চেতনাজগতে বন্দি এক আত্মশক্তিহীন প্রতিচ্ছবি।

মনোবিশ্লেষণভিত্তিক পাঠে বোঝা যায়, বনলতা সেন হলো সেই অবদমিত আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, যা চেতনা ও অবচেতনার সংযোগস্থলে জন্ম নেয়। জীবনানন্দ দাশের কবিতা জুড়ে এক ধরণের আত্মগোপনতা, নির্জনতা ও স্বপ্নচেতনা কাজ করে, যা ব্যক্তিগত বাস্তবতা থেকে দূরে, অবচেতন স্মৃতি ও ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত। বনলতা সেখানে এক ধরণের স্বপ্নাতীত মা-প্রতিমা, প্রেমিকা-প্রতিমা বা আত্মার পূর্ণতার কাঙ্ক্ষিত রূপ, যাঁকে ছাড়া কবি নিজেকে অসম্পূর্ণ ভাবেন। এই কাঠামোতে বনলতা নারী নন, বরং কবির 'ইগো'-এর ভিতরকার অন্তঃস্থ করুণ, স্মৃতিপূর্ণ, আত্মরতিময় যাত্রার শেষ দৃশ্যপট।

বনলতা সেন চরিত্রকে একরৈখিকভাবে নারীমূর্তি বা কেবল বিমূর্ত আকাঙ্ক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করা অসম্ভব। তিনি যেমন একজন নারী–সৌন্দর্যমণ্ডিত, নীরব, স্থির; তেমনি তিনি সময়চেতন কবির আত্মার প্রতিচ্ছবি–যিনি স্মৃতিতে থাকেন, বর্তমানকে আচ্ছন্ন করেন, এবং ভবিষ্যতের প্রার্থনাময় উপাসনা। তিনি নারী হয়েও নিজস্ব ভাষা হারানো নারী, আবার নিরবতার ভেতর দিয়ে কবির চেতনায় নেমে আসা এক গূঢ় প্রতীক। তিনি যেন বসে থাকা এক শান্তি, এক মোক্ষ, অথবা ক্লান্ত ইতিহাসের একমাত্র আশ্রয়স্থল। সুতরাং বনলতা সেন–নারীমূর্তি নন শুধু, তিনি বিমূর্ত আকাঙ্ক্ষাও; তিনি বাস্তব এবং অলীক; তিনি ব্যক্তিগত এবং চিরসাংস্কৃতিক–বাংলা কবিতায় একান্তভাবে অমর এক কাব্যিক সত্তা।

শেষপর্যন্ত বনলতা সেন এক দ্বৈত অস্তিত্ব–তিনি যেমন বাস্তব, তেমনই কল্পনা। তাঁকে পাওয়া মানে নিজেকে খুঁজে পাওয়া, আবার হারিয়ে যাওয়াও। তিনি নারী হয়েও নারী নন, আকাঙ্ক্ষা হয়েও বর্জনীয়। তিনি মুখ হয়েও মুখর নন–বরং এক নীরব নীহারিকা। "বনলতা সেন"–নারীর দেহ নয়, পুরুষ-কবির ক্লান্ত আত্মার এক অদৃশ্য নিভৃত আশ্রয়। তাঁর অস্তিত্ব, ঠিক যেন সময়ের ছায়ায় লুকিয়ে থাকা কোনো চিরকালীন আর্তি।

পরাবাস্তবতা ও জীবনানন্দ দাশের কবিতা

রঞ্জনকুমার ভট্টাচার্য

জীবনানন্দ দাশ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বিভিন্নজন তাঁকে বিভিন্ন অভিধায় ভূষিত করেছেন। কারও কাছে তিনি নিসর্গ প্রকৃতি চেতনার কবি, কারও কাছে দুঃখবাদী কবি, কারও কাছে অন্ধকারের কবি, কারও কাছে মৃত্যুচেতনার কবি, আবার কারও কারও দৃষ্টিতে তিনি পরাবাস্তববাদী ইত্যাদি। আমরা তাঁর কবিতায় পরবাস্তবতার প্রভাব দেখার চেষ্টা করব। প্রথমে আমাদের পরবাস্তবতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

ফরাসি দেশের বিখ্যাত স্নায়ুরোগ (Nephrologist) মনোরোগ (Psychiatrist) বিশেষজ্ঞ সিগমুন্ড ফ্রয়েড নিজ্ঞানের যে ধারণা দিয়েছিলেন এর প্রভাবে পূর্বতন ধারণাগুলো বাতিল হয়ে যায়, এমনকি মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞাও পাল্টে যায়। প্রাচীনকালে মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা থাকলেও ফ্রয়েডের নিজ্ঞানের ধারণা যখন প্রতিষ্ঠা পেল এবং তিনি মনোবিশ্লেষণ (Psycho analysis) পদ্ধতির দ্বারা প্রমাণ করলেন যে মানুষের চিন্তা, অনুভব ও শারীরিক কাজ অবচেতন মন কিংবা নিরজ্ঞানের দ্বারাই অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়, তখনই মনোবিজ্ঞান এক নতুন পথের সন্ধান পেল। যাই হোক ফ্রয়েডের এই নিজ্ঞানের ধারণা শুধুমাত্র মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান নয়, শিক্ষা, শিল্প তথা কাব্যজগতেও বয়ে আনল এক নতুন বার্তা, উন্মোচন হল নব তত্ত্বের, যে তত্ত্বের আলোকে সমৃদ্ধ হলো শিল্পের সমস্ত শাখা। আর, এ তত্ত্বই হলো 'পরাবাস্তবতা' (Surrealism)।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি জার্মান লেখক হুগো বল-য়ের আহ্বানে ত্রিস্তান জারা নামে এক উদ্যাস্তু তরুণ তার বন্ধুদের নিয়ে 'ডাডা' নামের এক আলোচনা পত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন, আর এই 'ডাডা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে খেয়াল খুশিমতো কাজ করা এবং এই 'ডাডা'র মূল ধারণাই পরে 'ডাডাইজম' নামে পরিচিত হয়।

ত্রিস্তান জারা তাঁর এই সাহিত্য আন্দোলনকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাইলে এবং ক্রমে ক্রমে ব্রেতো ও অন্যান্যরা এই আন্দোলনের সহযাত্রী হলে 'ডাডাইজমের' নামে এক বিশৃংখল কান্ডকারখানা শুরু হয়। ত্রিস্তান জারার বিখ্যাত উক্তি---

"সব রকম নিয়মের অভাব ও একটা নিয়ম এবং সেটাই শ্রেষ্ঠ নিয়ম।"

একটা কথা অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তখন প্রথম মহাযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। আর এই মহাযুদ্ধের নিদারুণ আঘাত মানুষকে করেছিল নীতি ও মূল্যবোধ বিবর্জিত, মানুষ হারিয়েছিল তার মানবতাবোধ, যার প্রভাব কিছুটা হলেও কবি ও শিল্পী মানসে বিস্তার লাভ করেছিল।

এ ধরনের উশৃঙ্খল আচরণ সমাজ বা সাহিত্য বেশিদিন গ্রহণ করে না। ১৯২১খ্রিস্টাব্দে জারার সঙ্গে ব্রেতোর মতাদর্শগত বিভেদ চরমে পৌঁছলে তিনি 'ডাডা' আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান এবং ফ্রয়েডের নিরজ্ঞান ধারণার সহযোগী হলে শুরু হয় পরা বাস্তববাদী শিল্প তথা সাহিত্য আন্দোলন। ১৯২৪য়ে প্রকাশিত হয় (Surrealism) বা পরাবাস্তবের ইস্তাহার এবং এই ইস্তাহারে ঘোষিত হয় নিরজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। এখানে ড. বরুণজ্যোতি চৌধুরীর অনবদ্য বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য–

"১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তার ধ্বংসলীলা অবলোকন করে মানুষ যখন মানসিক স্তরে দিশেহারা ও বিপর্যস্ত, তখনই মানবতার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদীদের ষড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই শিল্প দর্শন গড়ে উঠল। স্বপ্নে ও অবচেতনে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত নৈরাজ্য, বিনষ্টি, ভাঙন, অবিশ্বাস ও রিক্ততার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইলেন, চাইলেন শুদ্ধ বাস্তবের প্রতিষ্ঠা। বাস্তব যখন তিক্ত স্বাদ নিয়ে হাজির হল, তখন তাঁর অবচেতনে বিশ্বাস ও মুক্তি কে অনুসন্ধান করতে চাইলেন। আর এই তাগিদ থেকেই জন্ম নিল পরাবাস্তববাদী শিল্প দর্শন।"

এককথায় বিধি নিয়ম ও যুক্তিতর্কের গণ্ডির বাইরে অবচেতন মনকে রূপায়িত করাই হল পরাবাস্তবতা বা Surrealism এবং এর যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, রবীন্দ্র যুগে জন্মগ্রহণ করেও রবীন্দ্র ছায়া থেকে সরে আসা বাংলা কবিতার মাইলফলক জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমরা তা অনুধাবন করার চেষ্টা করব ---

কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের 'নাম' কবিতায় প্রথম লাইনেই বলেছেন ---

'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'

-- এ পথ এখানে এক অতিবাস্তবের পথ, বাস্তবতার পথ নয়। প্রেয়সীর চুলকে বিদিশার নিশার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন---

'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।'

এখানেও কবি সৃষ্টি করেছেন পরা বাস্তবতার জগৎ।

"সারারাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে।
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনো বিছানা ছেড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে।"

---কবি জীবনানন্দ ধূসর প্রিয় মৃত মুখগুলোকে দেখেছেন 'নক্ষত্রের' মাঝে। 'নক্ষত্র' শব্দটিকেও পরাবাস্তবতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'শঙ্খমালা' কবিতায় রয়েছে চরম পরাবাস্তবতার নিদর্শন। তাঁর আকাঙ্ক্ষিত শঙ্খমালা প্রেতিনী, 'কড়ির মতন সাদা শাদা মুখ তার,/ দুইখানা হাত তার হিম;/ চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম চিতা জ্বলে।'

'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায় লক্ষ করা যায় পরাবাস্তবতার প্রকাশ -

"আবার আকাশে অন্ধকারে ঘন হয়ে উঠেছে।
আলোর রহস্যময়ী সহোদরের মতো এই অন্ধকার।"

এখানে 'আবার' শব্দটি দেখে বুঝা যায় কবির আকাশ আগেও অন্ধকার ছিল।নএই কবিতার একদম শেষে কবি বলেছেন---

'তোমার নগ্ন নির্জন হাত'–

এই 'তোমার' শব্দটি এখানে কবির কল্পনার প্রতীক।

এভাবেই আমরা দেখতে পাই কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় নানা শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে বাস্তবতার মায়া ছেড়ে চলেছেন পরাবাস্তবতার মায়ায়।

সবশেষে একথাই বলব যে, কবি তাঁর কবিতাগুলিতে যে চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন, তা যুক্তিগ্রাহ্য কিংবা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও রয়েছে সুশৃংখলতা, যা মনকে আকর্ষণ করে, চেতনায় প্রবেশ করে আত্মাকে নাড়িয়ে দেয়। তিনি অধরা সৌন্দর্যের পিয়াসী নন, তাই বাস্তবের সীমা অতিক্রম করে খুঁজেছেন পরাবাস্তবতাকে।

তথ্যসূত্রঃ

১। 'স্বদেশ', জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা, ৩০ জুন ২০০২, করিমগঞ্জ।

২। 'আধুনিকতা আধুনিকোত্তর বাদ উত্তরআধুনিকতা তত্ত্ব ও প্রয়োগ'- ড. বরুণজ্যোতি চৌধুরী।

জীবনানন্দের কবিতায় আধুনিকতা, প্রকৃতি, নিঃসঙ্গতা ও সময় চেতনা

মনিদীপা দেব

বাংলা কবিতার ইতিহাসে জীবনানন্দ দাশ এক অসাধারণ, অনন্যসাধারণ কবি। রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিকতার সন্ধিক্ষণে তিনি বাংলা কবিতায় এমন এক ঘরানার সূচনা করেন, যা কবিতাকে গভীর, বিমূর্ত ও জটিল অস্তিত্ববাদের দিকে নিয়ে যায়। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি, নিঃসঙ্গতা, সময়-চেতনা এবং আধুনিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা একত্রে ধরা পড়ে। জীবনানন্দ দাশ শুধু কাব্যিক ভাষার দিগন্ত প্রসারিত করেননি, আধুনিক মানুষের অস্তিত্ব সংকট ও আত্মচেতনার প্রকাশেও অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

১. আধুনিকতাঃ

জীবনানন্দ দাশ বাংলা কবিতায় আধুনিকতার অন্যতম পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতা যে নতুন রূপ লাভ করে, তার প্রধান কারিগর জীবনানন্দ। আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য হিসেবে যা বিবেচিত হয়–বিষাদের আধিপত্য,বাস্তবতা থেকে বিমূর্ততার দিকে গমন, চেতনার প্রবাহ, অবচেতন মন ও স্বপ্নবিশ্বের অনুসন্ধান– এই সবকিছুর স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে তাঁর কবিতায়। উদাহরণস্বরূপ, "বনলতা সেন" কবিতায় আমরা দেখি এক ক্লান্ত, পথহারা মানুষের আত্মদর্শন, যেখানে প্রেম, বিষাদ, ক্লান্তি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা একাকার হয়ে গেছে।

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি..."

এই কবিতার ভাষা, চিত্রকল্প ও মনোভাব আধুনিকতার নিদর্শন।

২. প্রকৃতিচেতনা:
জীবনানন্দের কবিতার আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেম ও নিবিষ্ট চেতনা। তবে তাঁর প্রকৃতিচিত্রণ রবীন্দ্রনাথের মত প্রাণময়, সর্বজনীন বা আধ্যাত্মিক নয়। বরং তাঁর প্রকৃতি অনেক বেশি নিঃসঙ্গ, নীরব এবং মৃতের সঙ্গী। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি শুধু নান্দনিক নয়, অস্তিত্বের প্রতিচ্ছবি। যেমন – "আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে– এই বাংলায়..." কবিতায় এক মৃত্যুচিন্তিত মানুষের 'প্রকৃতিতে ফিরে আসার' বাসনা ফুটে ওঠে।

"পৃথিবীর তীরে
ফিরে আসিব আমি, ক্লান্ত রাত্রির ক্লান্ত শব্দের তরে।"

এখানে প্রকৃতি যেন মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী আশ্রয়।

৩. নিঃসঙ্গতা:
জীবনানন্দ দাশের কবিতার কেন্দ্রে রয়েছে নিঃসঙ্গতা। এই নিঃসঙ্গতা শুধু বাহ্যিক নয়, বরং অস্তিত্বগত। তিনি ছিলেন 'অলস' কিংবা 'উদাসীন' মানুষদের কবি। নগরজীবনের কোলাহলের মাঝেও মানুষের ভেতরের একাকিত্ব তিনি তুলে ধরেছেন নিপুণভাবে। "নীরবে তুমি" বা "আমি ক্লান্ত প্রাণ এক" কবিতাগুলোতে এই নিঃসঙ্গতার মূর্ছনা রয়েছে। জীবনানন্দ যেন আধুনিক মানুষের ভেতরের অন্ধকার, অনিশ্চয়তা ও সংশয়কে তুলে ধরেন।

"আমি এক ক্লান্ত প্রাণ, একাকী –
যে জীবনের প্রেমে পড়েছিল;
সে এখন শুধুই এক স্বপ্ন।"

৪. সময় চেতনা:
জীবনানন্দের কবিতায় সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। তিনি সময়কে দেখেন ধ্বংস, স্মৃতি ও পুনর্জন্মের প্রেক্ষাপটে। সময় তাঁর কবিতায় শুধু ঘড়ির কাঁটার চলন নয়, বরং অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝখানে টিকে থাকার এক যন্ত্রণাময় অনুভব। তাঁর কবিতায় সময় অনেক সময় চক্রাকার– যেখানে 'আবার ফেরা'র আকুতি রয়েছে আবার কোথাও কোথাও সময় এক অবিরাম ক্ষয়।

"এই নগর রাতের আলোয় ভরে গেছে–
তবু কোথাও যেন অন্ধকার পড়ে থাকে।"

এই 'অন্ধকার' সময়ের অমোঘ ছায়া– যা মানুষকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

জীবনানন্দ দাশ বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রকৃত রূপদাতা। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি, নিঃসঙ্গতা, সময়চেতনা এবং অস্তিত্ববাদের গভীরতা একত্রে মিশে গিয়ে এক অনন্য কাব্যভাষা নির্মাণ করেছে। বাংলা কবিতা তাঁর হাতে এক নতুন বাঁক নেয়–যেখানে রোমান্টিকতা ও বাস্তবতা, স্বপ্ন ও বিভ্রম, জীবন ও মৃত্যু এক অপরূপ ভারসাম্যে ধরা পড়ে। জীবনানন্দের কবিতা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ তিনি কেবল কবিতার ভাষা নয়, মানুষের চেতনাকেও নতুনভাবে অনুধাবন করতে শিখিয়েছেন।

শাশ্বত নারী

বনানী চৌধুরী

এক শাশ্বত নারীকে সৃষ্টি করেছ কবি
সমস্ত হৃদয়ের রং মিশিয়ে মানস ক্যানভাসে,
প্রকৃতি আর পুরুষের চিরকালীন ভালোবাসা
বিমূর্ত হয়েছে তোমার কল্পনার কলমে,
ক্লান্ত জীবনের শেষে শান্তির খোঁজে
পুরুষ চেয়েছে এক কোমল প্রকৃতির স্পর্শ,
দিশেহারা নাবিকের কান্ডারীর মত
নারী হয়েছে পুরুষের পথ প্রদর্শক।
বিদর্ভ নগরী থেকে বিশ্বায়নের বিশ্বে
বিদুষী নারী দেখিয়েছে পথের দিশা,
কবির কল্পনায় তাই সৃষ্টি হয়েছে যে নারী
সেই তো একুশ শতকের দুর্গা,
যুগে যুগে হাজার বছর ধরে
নারী প্রকৃত শান্তির আশ্রয় স্থল,
তীব্র অন্ধকার থেকে আলোর দিশারী
জীবনানন্দের কল্পনার সেই নারী
'নাটোরের বনলতা সেন'।

জীবনানন্দ দাশ ও বিদেশি কবিদের প্রভাব

অলকা চক্রবর্তী

জীবনানন্দ দাশ আজ এই নামটি শুধু বাঙালি বা বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এই নাম আজ পাশ্চাত্যের জগতে ও জনপ্রিয়। কবি জীবনানন্দ দাশ ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক অতএব এই ইংরেজি সাহিত্যের বহুমাত্রিক প্রভাব কবি মনে বাসা বেঁধেছিল। জীবনানন্দ দাশ বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান আধুনিক বাঙালি কবি। লেখক ও প্রাবন্ধিক কবি জীবনানন্দ দাশ পেশায় একজন কবি উপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, গীতিকার, সম্পাদক এবং একজন অধ্যাপক। তিনি ১৯২৭ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত কর্মজীবনে রত ছিলেন । গ্রাম বাংলার পরিবেশ ও রূপকথার পুরাণের জগতে নিমগ্ন থাকায় আজ কবি 'রূপসী বাংলার কবি' অভিনয় খ্যাত হয়েছেন।

যৌবনের প্রারম্ভেই জীবনানন্দের কবি প্রতিভা বিকশিত হতে শুরু হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ১৯২৫ এর জনের মৃত্যুবরণ করলে জীবনানন্দ তার স্মরণে 'দেশ বন্ধুর প্রয়াণে' নামক একটি ব্রহ্মবাদী কবিতার রচনা করেন যা বঙ্গবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কবিতাটি পরবর্তীতে তার প্রথম কাব্য সংকলন ঝরা পালকে স্থান করে। কবিতাটি পড়ে কবি কালিদাস রায় মন্তব্য করেছেন এ ব্রহ্মবাদী কবিতা নিশ্চয়ই কোন প্রতিষ্ঠিত কবি ছদ্মনামে রচনা করেন। তিনি তখন অনেক তরুণ কাব্য রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করেন ধীরে ধীরে কলকাতা ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় তার লেখা ছাপা হতে থাকে। যেগুলোর মধ্যে ছিল সে সময়কার সুবিখ্যাত পত্রিকা কল্লোল

কালিকলম প্রগতি প্রভৃতি। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে কবি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরা পালক প্রকাশ করেন। সে সময় থেকেই তিনি তার পারিবারিক উপাধি দাশগুপ্তের বদলে কেবল 'দাশ' লিখতে শুরু করেন।

জীবনানন্দ ইউরোপীয় কাব্যধারাকে গ্রহণ করেছেন এবং সফলভাবে বাংলা কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। তিনি রবীন্দ্র যুগের অন্যতম প্রধান আধুনিক বাংলা কবি তিনি বাংলা কবিতার আধুনিক প্রতিকৃতি। রবীন্দ্র জোয়ারের যুগে অধিকাংশ বাঙালি কবি যখন ভেসে যাচ্ছেন তখন জীবনানন্দ পাশ্চাত্যের কবিদের হাত ধরে হাঁটার অন্য পথ গ্রহণ করলেন সেই সময় বিখ্যাত কবি এলিওট, উইলিয়াম বাটলার ইয়েটাস এবং উনিশ শতকের রোমান্টিক কবি ওয়ার্থ সেলিম কিটস স্যার আর্থার কোনান ডুয়েল এইচ ডি ওয়েলস তাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছেন তা এখানে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

জীবনানন্দ দাশ শুধু বাঙালি কবিদের ধারাই নয়, বিদেশি কবিদের দ্বারাও উপকৃত হয়েছিলেন। জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটির মূল উৎস অ্যালেনের কবিতা 'টু হেলেন'। কবিতাটি বনলতা সেন লেখার সময় জীবনানন্দ দাশ হুবহু অনুকরণ করেছেন হেলেনের কবিতাটি আজ বাঙালির আপামর জনসাধারণের হৃদয়ে স্থান অধিকার করেছে। কবি এডগার এডগার এর কবিতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ছায়ার মতো তা অনুকরণ করেন এবং নিজস্ব ভঙ্গিমায় তা ফুটিয়ে তোলেন।

'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাটিতেছি পৃথিবীর পথে
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয়সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি বিম্বিসার অসুখের ধূসর জগতে
যেখানে ছিলাম আমি বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে'

এখন 'টু হেলেন' নামক কবিতার কিছু অংশ তুলে ধরলাম এই কবিতাটিকে কবি মূলত নারীর আপামর সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করেছেন তিনি লিখেছেন

'Helen, thy beauty is to me
Like those nicean barks of you're
That gently o, er a perfumed sea
The weary way worn wandered bore
To his own native shore'

এই দুই কবিতার মাঝে হুবহু মিল আছে। অ্যালেন এই কবিতায় এক নারীর সৌন্দর্যের কথা তুলে ধরেছেন তাকে কবি হুবহু ছেপেছেন একজন সুন্দরীর প্রেমে যেমন নতুন কবিতা লেখা যায় তেমনি এক নিঠুর কবিতার প্রেমে পড়েও অনুরূপ আরেকটি নতুন কবিতা রচনা করা যায়। জীবনানন্দের বনলতা সেন কবিতায় আমরা দেখি এক হালভাঙ্গা মানুষ দারুচিনি দ্বীপের ভেতর পথের সন্ধান খুঁজে পায়। এডগার হেলেন মাধুরীতে তিনি তাকে নাবিক না বলে বলেছেন ক্লান্ত পরিব্রাজক। হেলেনের সৌন্দর্য কবিকে তার আবাসভূমি রোম ও গ্রীস সভ্যতায় পৌঁছে দেয। বনলতা সেন কবিতায় আরো একজন কবির ছায়াপাত দৃশ্য, তিনি হলেন কি টসের সনেট চতুর্দশপদী 'on the first looking into chapmans homer' এ কবিতার কিছু পঙক্তি আলোচনা করছি

'Much have I traveled in the realms of gold?
And many goodly states and kingdoms seen;
Round many western islands have I been
Which bards in fealty to Apollo hold"

এখন জীবনানন্দের লেখা কবিতার দুটি লাইন পড়ে দেখা যাক-
'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,

সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;'

এই পংক্তিগুলোর সঙ্গে 'বনলতা সেন'-এর শুরুর পংক্তিগুলো মেলালেই কিছুটা সাদৃশ্যের বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। তাহলে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় এই বনলতা সেন কবিতাটি বিদেশি কবিদেরই লেখা কবিতা থেকে অনুকরণ করে জীবনানন্দ দাশ ফুটিয়ে তুলেছেন আরো সুন্দরভাবে।
এখন আরেকজন কবির প্রসঙ্গে আসা যাক যাকে ঘিরে জীবনানন্দ আবারও উদ্বুদ্ধ ও উৎফুল্লিত হয়ে অনুকরণ করেছেন তার কবিতাগুলি। তাঁর নাম উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস। কথিত আছে যে তিনি জীবনানন্দের সবচেয়ে প্রিয় কবিদের মধ্যে একজন। ইয়েটসের প্রথম কাব্য 'Crossways'-এর (১৮৮৯) 'The Falling of the Leaves' ও 'Ephemera' কবিতা-দুটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় জীবনানন্দ দাশ এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।
'Your eyes that once were never weary of mine
Are bowed in sorrow under pendulous lids,
Because our love is waning
And then she:
Although our love is waning, let us stand
By the lone border of the lake once more,'

ইয়েটস আরও লিখেছেন,
'The woods were round them and the yellow leaves
Fell like faint metcors in the gloom,'

ইয়েটসের এই কবিতাটি অনুকরণ করে 'অঘ্রান প্রান্তরে' কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন,
'জানি আমি তোমার দুচোখ আজ আমাকে খোঁজেনা,
আর পৃথিবীর পরে—
বলে চুপে থামলাম, কেবলি অশ্বত্থপাতা পড়ে আছে ঘাসের ভিতরে
শুকনো মিয়োনো ঘেঁড়া;—অঘ্রান এসেছে আজ পৃথিবীর বনে;
সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু; বললে সে, 'ঘাসের ওপরে সব বিছানো পাতার
মুখে এই নিস্তব্ধতা কেমন যে-সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার
ছড়িয়ে পড়েছে জলে',

জীবনানন্দের কবিতা এবং ইয়েটস কবিতার মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। দুটি কবিতার বার্তা ও অন্তরঙ্গ স্বরূপ একএছাড়াও জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের 'দুজন' কবিতায়ও 'Ephemera' কবিতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রেমের বেদনা দুঃখ এই কবিতা দুটিতে খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ্য। ইয়েটস ও জীবনানন্দের কবিতা দুটির মধ্যে তুলনা করলেই বোঝা যাবে, জীবনানন্দ ইয়েটসের কবিতার থেকে অনুকরণ করে রচনা করলেও নতুন বাংলা শব্দ যোগ করেছেন। যোগ করেছেন নতুন অনেক অনুষঙ্গ, যেমন– 'সোনালি ডানা', 'ভিজে মেঘের দুপুর', 'ধানসিড়ি নদী', 'বেতের ফলের মতো', 'রাঙা রাজকন্যা', 'হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানো'। ইয়েটসকে অনুকরণ করে লেখা হলেও 'হায় চিল' যে অত্যন্ত সুন্দর, তাতে কোন অবকাশ নেই অতএব বুঝা যায় জীবনানন্দ দাশের লেখা প্রত্যেকটি কবিতা এ যেন বিদেশি কবিদের ছোঁয়া লেগে আছে। তিনি বিদেশি কবিদের অনুকরণ করে কবিতাগুলো লিখেছেন সমস্ত জীবন তাদেরকে অনুকরণ করেই তিনি চলেছেন এবং কবিতাগুলো একটি নতুন রূপে উপস্থাপন করেছেন।

তথ্যসূত্র:- https:nobojagaran.com
abdulalim.in
https://abdulalim.in
Wikipedia: https://bn.wikipedia.org

প্রকৃতির কবি

চান্দ্রেয়ী দেব

সবুজের বক্ষে খুঁজে পাই ঘ্রাণ
নিঃশব্দে বয়ে যাওয়া হাওয়ায়
গাছের ডালে বসে থাকা বলাকার আলাপনে
দেখতে পাই তোমার নীরব আঁখিদ্বয়
তুমি হলে আমাদের প্রকৃতির কবি

ক্লান্ত নির্ঘুম দুপুরে একা ঘরে
জাপটে ধরে যখন আমায় নিজস্বতা
জীবন যুদ্ধ এসে পাশে দাঁড়ায়
ভয়চকিত হৃদয়ে মুখ লুকাই আঁধারের আচ্ছাদনে
নিভে যাওয়া পড়ন্ত আলোয় দেখি
তোমার মুখ স্বপ্নমাখা পরিচ্ছন্ন জগতে
তুমি হলে আমাদের প্রকৃতির কবি

রজনীর নির্জনতা ক্রমশ বাড়তে থাকলে
চন্দ্রমার শহর জুড়ে তারাদের দল গল্প জমায়
মৌনতায় ভেসে যাওয়া যানযটবিহীন লোকারণ্যে
নিজের মধ্যে সন্ধান পাওয়া আমির মাঝামাঝি
লক্ষ্য করি তোমার সৃষ্ট জীবন্ত শব্দগুলোর আসা-যাওয়া
তোমার মাঝেই আমার জীবনের আনন্দ
তুমি আমাদের প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ।।

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা,
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই, প্রীতি নেই,
নেই করুণার আলোড়ন পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।"

-জীবনানন্দ দাশ

পরবর্তী আলোচনা সংখ্যার বিষয়
'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

প্রকাশিত হবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ শনিবার

মাসিক বৈঠকের এই আলোচনা সংখ্যা বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য কর্তৃক উত্তরসূরি থেকে প্রকাশিত এবং স্কলার পাবলিকেশনস্ থেকে মুদ্রিত।
আলোচনা সংখ্যাটি উত্তরসূরি কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।
বিনিময় মূল্য: ২০ টাকা